Aslaf Academy

লেকচার ৫ : মাতা-পিতাহীন শৈশবে নবীজি (সঃ)।

কোর্সঃ সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেকচার ৫ : পিতা-মাতাহীন শৈশবে নবীজি (সঃ)।

নবীজির পিতার পরিচয় ও তাঁর ইন্তেকালের বিবরণ -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার নাম আব্দুল্লাহ। তাঁর (আব্দুল্লাহর) মাতার নাম ফাতিমা। আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর এবং সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তাঁর লকব বা উপাধি ছিল যবিহ।

তাঁকে যবিহ বলার পেছনে আছে একটি সুন্দর ও আশ্চর্য ঘটনা। এককালে তাঁর পিতা আব্দুল মুত্তালিবকে স্বপ্নে জমজমের সন্ধান দিয়ে তা খুঁড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়। তখন কুরাইশদের তিনি এ কথা জানান এবং তাদের সাহায্য চান; কিন্তু কুরাইশরা তাঁকে কূপ-খননে সঙ্গ দেয়নি এবং তখন শুধুমাত্র পুত্র হারিসকে নিয়ে সেই কাজ তাঁকে করতে হয়েছিলো। তখনই তিনি মানত করেছিলেন, কখনো আল্লাহ যদি তাঁকে অনেকগুলো পুত্রসন্তান দান করেন, আর তারা সুস্থ-সবল যুবকে পরিণত হয়, তাহলে তাদের ভেতর থেকে একজনকে তিনি আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করবেন।

আব্দুল মুত্তালিবের প্রার্থিত পুত্রসংখ্যা যখন দশজন হলো এবং তাঁরা সকলেই সুস্থ-সবল যুবকে পরিণত হয়ে আত্মরক্ষা করার যোগ্যতা অর্জন করলেন, তখন আব্দুল মুত্তালিব তাঁদেরকে তাঁর সেই মানত সম্পর্কে অবহিত করেন। তাঁরা সকলেই এ প্রস্তাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

কথিত আছে, আব্দুল মুত্তালিব ছেলেদের মধ্যে কাকে কোরবানি করা যায়, এ ব্যাপারে লটারি করলেন। লটারিতে আব্দুল্লাহর নাম উঠলো, অথচ তিনি ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। এমতাবস্থায় আব্দুল্লাহ মুত্তালিব বললেন, হে আল্লাহ, তাকেই কোরবানী করবো, নাকি একশত উট? অতঃপর আবার আবদুল্লাহ ও একশত উটের মধ্যে লটারি করলে একশত উটের নাম ওঠে। তিনি একশত উট জবাই করেন। এর আগে আরবে একজন ব্যক্তির রক্তের পণ ছিলো দশ উট; এই ঘটনার পর তা একশত সংখ্যায় উন্নীত হয়।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে, আমি দুই যবিহের সন্তান : একজন নবী ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) এবং অন্যজন আমার পিতা আব্দুল্লাহ।

আব্দুল মুত্তালিব স্বীয় সন্তান আব্দুল্লাহর বিবাহের জন্য আমিনাকে মনোনীত করেন। বংশ-পরম্পরা এবং মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁকে কুরাইশ-গোত্রের মধ্যে উন্নত মর্যাদার মহিলা ধরা হতো। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত বনু যোহরা গোত্রের দলপতি।

আব্দুল্লাহ এবং আমিনার বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর আমিনা মক্কায় স্বামীগৃহে আগমন করেন এবং স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই আব্দুল মুত্তালিব ব্যবসা উপলক্ষ্যে খেজুর আনয়নের উদ্দেশ্যে আব্দুল্লাহকে মদিনা প্রেরণ করেন।

কোনো কোনো সিরাতবিদ বলেন যে, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আব্দুল্লাহ শাম দেশে গমন করেছিলেন। এক কুরাইশ-কাফেলার সঙ্গে মক্কা প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও মদিনায় অবতরণ করেন। সেই অসুস্থতার মধ্যেই সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নাবেগা জাদির বাড়িতে তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচিশ।

মৃত্যুকালে তিনি যে সব সহায়-সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন, তা ছিলো : পাঁচটি উট, এক পাল ছাগল এবং একটি হাবশি দাসী, যার নাম ছিলো বরকত। তার উপনাম ছিল উম্মে আয়মান।[1]

মাতার মৃত্যু, দাদার প্রতিপালন -

বাবার মৃত্যুর পর নবীজীর বয়স তখন ছয়। তিনি দুধ-মা হালিমার কাছ থেকে ফিরে এসে মায়ের কাছেই আছেন। এই অতিক্রান্ত দিনগুলোতে থেকে থেকে নবীজীর মায়ের মনে পড়ে আব্দুল্লাহর কথা, মুহাম্মদের বাবার কথা, তাঁর স্বামীর কথা। তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। মুহাম্মদের দিকে তাকালে সে অস্থিরতা যেন আরও বাড়ে। এমন সুন্দর ছেলে, না বাবাকে দেখলো, না বাবা তাঁকে দেখলো! ভীষণ শোকে তিনি ভেঙে পড়েন। মা আমিনা মদিনায়

[1] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃষ্ঠা: ৯৯। যাদুল মাআদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ৭৫

যাওয়ার মনস্থির করলেন। তিনি অন্তত সমাধিস্থ আব্দুল্লাহর পাশে গিয়ে হলেও তার শোকের উপশম খুঁজতে চান।

শ্বশুর আব্দুল মুত্তালিবের ব্যবস্থাপনায় শিশুপুত্র মুহাম্মাদ এবং পরিচারিকা উম্মে আয়মানকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা-মদিনার মধ্যবর্তী পাঁচশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মদিনায় পৌঁছেন। সেখানে এক মাস অবস্থানের পর মক্কায় ফেরার উদ্দেশ্যে তিনি মদিনা থেকে যাত্রা করেন। সামনে মক্কা অনেক দূরের পথ, পেছনে মদিনা তুলনামূলক কম দূরত্বে অবস্থিত—এমতাবস্থায় মা আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে তাঁর অসুখ। নবীজীর সামনেই তিনি কাতর হতে থাকলেন মৃত্যুর দিকে। তারপর একসময় এতিম বালক মুহাম্মদ এবং আত্মীয়-স্বজনকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে 'আবওয়া' নামক স্থানে মা আমিনা মৃত্যুবরণ করেন।

মায়ের মৃত্যুর পর বেঁচে রইলো বৃদ্ধ দাদা। শোকার্ত দাদা পিতা-মাতাহীন নাতীকে নবুয়ত ও রিসালাতের নিকেতন মক্কায় নিয়ে এলেন। প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহর মৃত্যুতে আব্দুল মুত্তালিব যতটা ব্যথা অনুভব করেছিলেন, তারচেয়ে অনেক বেশি ব্যথা অনুভব করলেন পুত্রবধূ আমিনার মৃত্যুতে। কারণ, আব্দুল্লাহর মৃত্যুর পর শিশু মুহাম্মদের অবলম্বন ছিলেন তাঁর মা আমিনা। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর যে আর কোনো অবলম্বনই রইলো না। এ দুঃখ তাঁর শত গুণে বেড়ে গেলো। অন্যদিকে আবার এতিম শিশুটির জন্য তাঁর স্নেহ শতগুণে বেড়ে গেল। মনে হতো, যেন ঔরসজাত সন্তানের চেয়েও বেশি মাত্রায় তিনি তাঁকে স্নেহ করতে লাগলেন।[2]

দাদার মৃত্যু, চাচার প্রতিপালন -

দাদার প্রয়াণে মুহাম্মদের অভিভাবক হলেন চাচা আবু তালেব। ইবনে হিশামের বর্ণনায় আছে, কাবাঘরের ছায়ায় মুহাম্মদের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের জন্য বিশেষ একটি আসন বিছানো থাকতো। আব্দুল মুত্তালিব এ আসনে বসতেন এবং সন্তানগণ বসতেন সেই আসনের পার্শ্ববর্তী স্থানে। পিতার সম্মানার্থে তাঁর কোনো সন্তান এ আসনে বসতেন না। কিন্তু শিশু মুহাম্মদ সেখানে আগমন করে সেই আসনেই বসতেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে চাচারা তাঁর হাত ধরে

[2] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃষ্ঠা: ১০২

সেই আসন থেকে নামিয়ে দিতেন। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিবের উপস্থিতিতে সেই আসন থেকে তাঁকে নামানোর চেষ্টা করা হলে তিনি বলতেন, 'ওকে তোমরা এ আসন থেকে নামানোর চেষ্টা করো না, ওকে ছেড়ে দাও। আল্লাহর শপথ, এ শিশুকে আমার সাধারণ শিশু বলে মনে হয় না। ও হচ্ছে ভিন্ন রকমের এক শিশু, অনন্য এক ব্যক্তিত্ব।' তারপর তাঁকে নিজের কাছেই বসিয়ে নিতেন সে আসনে, তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সোহাগ করতেন এবং তাঁর চালচলন ও কাজকর্ম দেখে আনন্দ প্রকাশ করতেন।

মায়ের মৃত্যুতে একা মুহাম্মদ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের এমন স্নেহ আর আদরেই বড় হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু বাঁকে বাঁকেই দেখা গেছে, নবীজীর জীবনে চিরস্থায়ী একনাগাড় কোনো সুখ আপাত-স্থায়ী হয়নি। নবীজীর বয়স যখন আট বছর দুই মাস দশ দিন, তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করলেন। এ দুঃখ-শোকের মুহূর্তে দুঃখ-বেদনার বোঝা লাঘব করতে এগিয়ে এলেন চাচা আবু তালিব। খুশিতে তিনি আপন কাঁধে তুলে নিলেন বালক মুহাম্মাদের লালন-পালনের সকল দায়িত্ব। বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুর আগে আবু তালিবকেই ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন।

এই লালন-পালনের ভার বা অভিভাবকত্ব আবু তালিব তাঁর জীবদ্দশায় আর কোনো দিনই সরিয়ে নেননি। এমনকি মৃত্যুর সময়েও ভাতিজার প্রতি ছিলো তাঁর অপার মমতার ছাপ। নবীজীর যৌবনের শুরু ও রিসালাতের বেদনাবিধুর মক্কা-কাল, কোথাও তিনি নবীজীকে একা হতে দেননি; নবীজীর আদর্শ গ্রহণ না করলেও তাঁর প্রতি আবু তালিবের ছিলো সবরকমের সমর্থন। [3]

শিক্ষণীয় বিষয় -

একজন দাঈ যখন শৈশবেই অসহায়ত্ব এবং কষ্টের জীবনে অভ্যস্ত হন; তখন তিনি অতি মানবিক হয়ে বেড়ে ওঠেন। এবং এতিম, অসহায়, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি তিনি দয়াপ্রবণ হন। একজন দাঈর জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যখন মানুষের বিপদে অনুভূতিশীল

[3] যাদুল মাআদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ৭৫

হবেন, তখন তার বিপদেও মানুষ তার সাহায্যকারী হবে। আমাদের নবীজীর বেলায়ও তাই হয়েছে। নবীজীর সাহায্যকারী হিসেবে এ জাতীয় মানুষরাই তার পাশে ছিলেন। তিনিও সবসময় তাদের বিপদে পাশে ছিলেন। চড়াই-উৎরাইয়ের দাওয়ার জীবনে এটা খুবই কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ।